সংবাদ

তারিখ 31-OCT-2002
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

গ্রামভিত্তিক বৃত্তি প্রকল্প এবং দু'টি কথা

৯ই অক্টোবর ২০০২ তারিখে সংবাদ'-এর চিঠিপত্র বিভাগে গ্রামভিত্তিক বৃত্তি প্রকল্প চালু প্রসঙ্গে ওয়াহিদ মুরাদের লেখা একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন— আমাদের দেশের অসংখ্য ছাত্রছাত্রী শুধু টাকার অভাবে লেখাপড়া করতে পারে না। তাই তিনি সরকারের বর্তমান বৃত্তি কার্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সকল বুদ্ধিমান, সচেতন, স্বচ্ছল এবং বিদ্যোৎসাহী শিক্ষিত, চাকরিজীবী মানুষকে গ্রামভিত্তিক বৃত্তি প্রকল্প গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, বিকল্প পরিচালকগণ গ্রামের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়ার মান, স্কুল পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর মোতাবেক বিবেচনা করবেন। এক্ষেত্রে অবশ্যই ছাত্রছাত্রীকে মেধাবী এবং গরিব হতে হবে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত এ বৃত্তি কার্যক্রম চলবে। বৃত্তি প্রকল্পের ফান্ড হবে গ্রাম থেকে উঠে আসা চাঁদা বা স্বেচ্ছাদানকৃত তহবিলের মাধ্যমে। তবে এক্ষেত্রে সব বৃত্তি গ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীকে মনে রাখতে হবে- বৃত্তি প্রকল্পের দেয় টাকা দান নয় ধার বা ঋণস্বরূপ। তৃতীয় শ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীকে প্রতি মাসে দেয় টাকার অঙ্কের একটি হিসাবও তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও লিখেছেন, ১২ থেকে ১৬ বছরে প্রতিটা ছাত্রছাত্রী শিক্ষা জীবন শেষ করে চাকরি বা আয় উপার্জনে চলে যাবে। তার হিসাব অনুসারে গরিব অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা গ্রামভিত্তিক বৃত্তি প্রকল্প থেকে সর্বমোট ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকা নিয়ে এমএ, বিএ বা সমমানের ডিগ্রি নিয়ে সে টাকা পরিশোধ করার মতো যথেষ্ট সহায়ক শক্তি বৃত্তি গ্রহণকারীদের এক সময় এসে যাবে ইত্যাদি। ওয়াহিদ মুরাদের এহেন দেশাত্মবোধক এবং জনকল্যাণমূলক চিন্তা-চেতনার জন্য তাকে অবশ্যই সাধুবাদ জানাতে হয়। তবে বর্তমানে দেশে যে সামাজিক অবক্ষয় চলছে— সেখানে এমনতর সুপরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা মনে হয় সুদূর পরাহত। তবু সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে উঠে আসা এমন চিন্তা ও চেতনা প্রেরণাদায়ক।

ওয়াহিদ মুরাদ চট্টগ্রামের এক ডাক্তারের কথা উল্লেখ করেছেন— যিনি এখন লন্ডনপ্রবাসী। তিনি একটা এতিমখানা থেকে লেখাপড়া করে উচ্চশিক্ষিত ডাক্তার হয়েছেন। এখন প্রতিবছর সে এতিমখানার জন্য তিনি প্রায় দু'লাখ টাকার মতো দান করেন। যখন কারও লেখাপড়া করার চালিকা শক্তি হবে তখন সে সংগঠনের প্রতি তার ভক্তি শ্রদ্ধা বাড়বে এবং গ্রামের মানুষের কল্যাণ করার ইচ্ছা জোরদার হবে। ওয়াহিদ মুরাদের এ যুক্তির সঙ্গে আমরা একমত নই। যারা মনুষ্যত্ববোধ সম্পন্ন এবং উদার হৃদয়ের অধিকারী তারা সব সময়ই মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান। আর যারা অকৃতজ্ঞ-স্বার্থপর তাদের কাছ থেকে সমাজ ভাল কিছু আশা করতে পারে না। সুতরাং গ্রামভিত্তিক বৃত্তি প্রকল্প চালু করতে হলে বৃত্তি প্রকল্পের দেয় অর্থ গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে দান হিসেবেই দিতে হবে— ঋণ হিসেবে নয়। আর যেহেতু বৃত্তি প্রকল্পের তহবিল জনসাধারণের স্বেচ্ছাদানকৃত টাকা তা ঋণ হিসেবে দেয়া কাম্য হতে পারে না। যেসব গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রী বৃত্তি প্রকল্প হতে দান নিয়ে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবেন তারা তাদের নিজ তাগিদেই একদিন গ্রামভিত্তিক বৃত্তি প্রকল্পকে পরিপুষ্ট করতে এগিয়ে আসবেন। আর যারা দান নিয়ে পড়াশোনা করে অমানুষ হবে তাদের কাছ থেকে বৃত্তি প্রকল্প বৈরিতা ছাড়া আর কিছু আশা করবে না।

ওয়াহিদ মুরাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও দেশের প্রতিটি গ্রামের সচেতন, সচ্ছল, বিদ্যোৎসাহী, মনুষ্যত্ববোধ সম্পন্ন এবং সমাজসেবা মানসিকতার ব্যক্তিবর্গকে আহ্বান জানাই— আসুন সকলে মিলে গ্রামে গ্রামে এমনি ধরনের বৃত্তি প্রকল্প গড়ে তুলে দেশের অনাগত কানাচে পড়ে থাকা অসহায় গরিব ছিন্নমূল মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের দেশের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ব্রত গ্রহণ করি। আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী পরে' এই মহৎ বাণীতে যারা দীক্ষিত তারা এই মহৎ প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে আসলে জাতি কৃতার্থ হবে।

আবুল বাশার
তারাগুনিয়া- দৌলতপুর
কুষ্টিয়া-৭০৫১।

কৃতজ্ঞচিত্ত দায়িত্ববান এবং মহৎ হৃদয়ের মানুষ আমরা সমাজে সচরাচর দেখতে পাই। দেখা পাই এরই বিপরীত মেরুর অকৃতজ্ঞ-স্বার্থপর মানুষেরও। আমাদের গ্রামের এবং আশপাশের গ্রামের কয়েকজন ব্যক্তিত্বের উদাহরণ এখানে পেশ করছি। একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক- শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ। দেশের চিকিৎসা বিভাগের একটি শীর্ষ পদে তিনি সমাসীন। তিনি একজন নিতান্তই গরিবের সন্তান ছিলেন। গ্রামের মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা এবং নিজ প্রচেষ্টায় বর্তমান অবস্থানে পৌঁছেছেন। কিন্তু তিনি ভুলে যাননি তার গ্রামের গরিব জনসাধারণকে। যারা একদিন অবসরে তার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। বিপদে-আপদে তিনি গ্রামের মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান। সাধ্যমত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। গ্রামের মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সুযোগ পেলেই।

আর একজন স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান, গ্রামের মানুষের কোনরকম সহায়তা ছাড়াই নৈতিক অর্থানুকূল্যে তিনিও একজন চিকিৎসক হয়েছেন। বর্তমানে সেনাবাহিনীর উচ্চপদে নিয়োজিত। গ্রামবাসী ও সমাজের প্রতি তার দায়িত্ববোধ অনুকরণীয়। তিনি বছরে ২/৩ বার সময় নিয়ে গ্রামে আসেন এবং পূর্ব ঘোষণা দিয়েই বিনা পয়সায় শত শত গরিব জনসাধারণের রোগ চিকিৎসার পরামর্শ (প্রেসক্রিপশন) দিয়ে থাকেন, এমনকি প্রয়োজনে ওষুধও। গ্রামে তার অবস্থানকালে প্রতিদিন সকাল থেকে রাত অবধি যতক্ষণ রোগী উপস্থিত থাকেন, নিরলসভাবে রোগী দেখেন। তার হাসি মুখের আশ্বাসবাণী আশপাশের কয়েকটি গ্রামের আর্ত-অসহায় মানুষের পরম ভরসায় পরিণত হয়েছে। আর একজন তিনিও চিকিৎসক। শিশুকালে পিতৃহারা হন। নিতান্তই গরিব পরিবার বিধায় মায়ের অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায়। অসহায় এতিম শিশুর লালন পালনের দায় এসে পড়ে এক গরিব প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক চাচার ওপর। যেহেতু শিশুটি মেধাবী, চাচা তার লেখাপড়ার সুযোগ করে দেন। চাচা গ্রামের মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে খেয়ে না খেয়ে ভাতিজার পড়াশোনার খরচ যোগাতে থাকেন। গ্রামের মানুষও এই এতিম অসহায় শিশুটির ওপর সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে। এমনিভাবে একদিন চিকিৎসক হয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি সেনাবাহিনীর এক উচ্চপদস্থ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার; কিন্তু এখন তিনি গরিব চাচা-চাচী বা গ্রামবাসী যারা একদিন তার অসময়ের সহায় ছিল তাদের প্রতি কোন দায়িত্ব বা কর্তব্য বোধ করেন না। বরং অতীতকে ভুলে থাকতেই পছন্দ করেন। এমনি লোক যদি ঋণিত বৃত্তি প্রকল্প থেকে সাহায্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হন তারা কি কোনদিনই প্রতিদান দেবেন নাকি তাদের মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত হবে? দেশের আনাচে-কানাচে এমনতর কৃতজ্ঞ-অকৃতজ্ঞ মানুষ ছড়িয়ে আছে। যাদের নিয়েই আমাদের বসবাস। এসব উদাহরণ টানার কারণ— ওয়াহিদ মুরাদ লিখেছেন— এ ধরনের বৃত্তি প্রকল্প চালু হলে মেধাবী ও গরিব ছাত্রছাত্রীরা অসময়ে ঝরে যাবে না। তাদের মানুষের প্রতি মমত্ববোধ ও দায়িত্ববোধ ক্রমেই বাড়বে। কারণ লেখাপড়া করেছে যে গ্রামের তহবিল থেকে তাকে অতি সহজে ভুলে যাওয়া সম্ভব হবে না। বৃত্তি প্রকল্প